পঞ্চম অধ্যায় (5A)

মহাযাত্রার পদচিহ্ন

বন্যা আহমেদ
Email: bonna_ga@yahoo.com

চতুর্থ পর্বের পর ...

একে মহাযাত্রা না বলে আর কিই বা বলা যায়? প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে প্রাণ সৃষ্টির এক উষালগ্নে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিলো তা আর থমকে দাঁড়ায়নি এক মুহূর্তের জন্যও। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের পথ ধরে সরলতম প্রাণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আজকের এই নিরন্তর প্রাণের মেলা, বৈচিত্রে, বিস্তৃতিতে, বিন্যাসে, হাজারো প্রাণের সমারোহে এর তুলনা পাওয়া ভার। ডারউইনের ভাষায় 'There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved.' (১)। পথ যে খুব সুগম ছিলো তা বললে বোধ হয় ভুল হবে, নিঃসন্দেহে অজস্র বাঁধা পেরোতে হয়েছে তাকে - পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে অহরহ, তার ফশ্রুতিতে প্রাকৃতিক বিন্যাসও বদলে গেছে, গণ-বিলুপ্তির পথ ধরে ইতিহাসের বুক থেকে খসে পড়েছে প্রজাতির পর প্রজাতি। কিন্তু তার পথ চলা থেমে থাকেনি, বিবর্তনের পথ ধরে পুরনোরা আভিযোজিত হয়ে খাপ খাইয়ে নিয়েছে প্রকৃতির সাথে, একের পর এক নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, অন্তহীন এই মহাযাত্রা এগিয়ে গেছে স্বতঃস্ফুর্ত গতিতে, অনির্ধারিত ভবিষ্যতের দিকে। এই পথ চলার তো কোন গন্তব্য নেই, কেউ একে পথের নির্দেশনা দিয়ে ব্লু প্রিন্ট এঁকে দেয়নি, কোন কারিগরের কেরামতি নেই এখানে। প্রাণের এই মহা আয়োজন এগিয়ে চলেছে প্রকৃতির গতির সাথে তাল মিলিয়ে, প্রকৃতিরই অংগাঅংগি এক অংশ হয়ে। আর এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সে ফেলে এসেছে তার পথ চলার বিভিন্ন ধরণের সাক্ষ্য, যদিও তার অর্থ বুঝতে আমাদের লেগে গেছে এতোগুলো শতাব্দী।

প্রাচীণকাল থেকেই মানুষ ফসিলের অস্তিত্ব জেনে আসলেও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে মাত্র কয়েক শো বছর আগে। ফসিল থেকে আমরা প্রাণের বিবর্তনের সরাসরি সাক্ষ্য খুঁজে পাই। ভূতত্ত্ববিদ এবং ফসিলবিদরা আঠারশো শতাব্দির শেষ দিক থেকে ফসিলগুলো আসলে কি তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে শুরু করলেও চার্লস ডারউইনই প্রথম একে বিবর্তনের আলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। জেনেটিক্স, জিনোমিক্স এবং অনুজীববিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে আজকে জীবের ডি.এন.এ থেকেই বিবর্তনবাদের মূল তত্ত্বকে প্রমাণ করা গেলেও কয়েক দশক আগেও কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ছিলো না। আমরা তো ডি এন এর খবর জানলাম মাত্র সেদিন আধা শতাব্দী আগে (১৯৫৩ সালে), জিন বলে যে একটা কিছু আছে তাও জানতে পেরেছি মাত্র এক শতাব্দী আগে (মেন্ডেলের আবিষ্কার সম্পর্কে পৃথিবী জানতে পারে ১৯০০ সালে)! তার অনেক আগেই প্রজাতি যে স্থির নয়, কিংবা ধরুন পৃথিবীর বয়স যে আসলে বাইবেলে বলে যাওয়া ৬ হাজার বছরের চেয়ে অনেক বেশী, অথবা সবগুলো মহাদেশ যে একসময় এক সাথে ছিলো- এধরণের কিছু মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে ফসিল রেকর্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালণ করেছে। সে সময় ফসিল রেকর্ডগুলো না থাকলে ডারউইনের দেওয়া বিবর্তনবাদ তত্ত্ব বা আলফ্রেড ওয়েজেনারের মহাদেশীয় সঞ্চরণের মত গুরুত্ত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো আমরা পেতাম কিনা তা নিয়ে যথেস্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছিলাম ডারউইন তার বিগেল যাত্রার

সময় পৃথিবীর আনাচে কানাচে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলো দেখে কিভাবেই না প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখন অনেক গবেষক আবার বলছেন, শুধু বিজ্ঞানের অঙ্গনেই নয়, আমাদের পূর্বপুরুষের এই ফসিলগুলোর নাকি অভুতপূর্ব অবদান রয়েছে আমাদের প্রাচীন লোককাহিনী, বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ভুবনেও!

দানবীয় আকারের সামুদ্রিক সরীসৃপ বা ডায়নোসর জাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর ফসিলের ধ্বংসাবশেষ দেখেই প্রাচীন আমলের মানুষেরা হয়তো অনেক ধরণের কল্পকাহিনী বা মিথের জন্ম দিয়েছিলো। লোককাহিনীর গবেষক আড্রিয়ানা মেয়র (Adrienne Mayor, 2000) এর লেখা The First Fossil Hunters বা প্রথম ফসিল শিকারীরা বইটা সম্প্রতি ভুতত্ত্ববিদ্যার অঙ্গনে সাড়া ফেলে দিয়েছে (২)। একটার পর একটা উদাহরণ টেনে, বিভিন্ন ধরণের লোকজ গল্পের অবলম্বনে তৈরি প্রাচীন ছবি বা ভাষ্কর্যের সাথে বিভিন্ন ফসিলের তুলনা করে, আড্রিয়ানা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে আজকে আমরা যে সব মিথের কথা শুনি তার অনেকগুলোরই ভিত্তি হয়তো লুকিয়ে রয়েছে ফসিলের মধ্যেই। প্রাচীণ আমলের মানুষ দৈত্যাকৃতি সব আদিম প্রাণীদের হাডডি বা ফসিল দেখে শুধু যে আতঙ্কিত হয়েছে তাইই নয়, নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ত্রাস আর বিহ্বলতার মেলবন্ধনে সে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন রূপকথার, এমনকি কখনও অজানা শ্রদ্ধায় তাদের স্থান করে দিয়েছে পূজার বেদীতে। ফসিল রেকর্ড নিয়ে গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ঢোকার আগে মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতার এই মজার অধ্যায়টিতে একটু চোখ বুলিয়ে নিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করলে ফসিলবিদ্যার ইতিহাস কিন্তু খুব বেশী দিনের নয়, সাধারনভাবে মাত্র ২০০ বছর আগের ফরাসী প্রকৃতিবিদ জর্জ কুভিয়েকে (Georges Cuvier, 1769 - 1832) এর জনক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আড্রিয়ানা ফসিলবিদ্যা চর্চ্চার সেই সময় সীমাটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কয়েক হাজার বছরের বিস্তৃতিতে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ জন বোর্ডম্যানের মতে, আড্রিয়ানায়ই প্রথমবারের মত ধারাবাহিকভাবে ফসিলের সাথে প্রাচীন মিথগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে নতুন করে অর্থবহ করে তুলেছেন আমাদের সামনে। প্রাচীন গ্রীক, রোমানসহ ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সভ্যতাগুলো প্রাচীনকাল থেকেই ফসিল সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ পর্যন্ত করেছে, আর স্বভাবতই তাদের তদানীন্তন জ্ঞানের আলোয় মিলিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করেছে। সেখান থেকেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের মিথের, সৃষ্টি হয়েছে মহাপরাক্রমশালী মহানায়ক থেকে শুরু করে ভয়ঙ্করী সর্পরাজ কিংবা সাইক্লোপের মত এক চোখী বিশালদেহী দৈত্যের। প্রাচীন গ্রীকরা যে প্রাচীন দৈত্যাকৃতি জিরাফ, ম্যমথ বা মাসটাডোনের মত বিলুপ্ত অতিকায় হাতীর ফসিলের সংস্পর্শে এসেছিলেন ইতিহাসে তার ভুড়িভুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আডরিয়ানা গ্রীস এবং তার আশে পাশের অঞ্চলের প্রাচীন ধ্রুপদী লোককাহিনীর লেজেন্ড গ্রিফিনের সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন প্রোটোসেরাটপ নামের প্রাচীণ এক ডায়নোসরের ফসিলের। আসলে গ্রিফিন কোন গ্রীক বা রোমান লেজেন্ড নয়। শোনা যায়, খ্রীষ্ট পূর্ব ৭০০-৬০০ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার সাইথিয়ান নামের এক যাযাবর জাতির থেকে গ্রীক পর্যটক অ্যারিস্টিয়াস প্রথম এই গ্রিফিনের কথা জানতে পারেন। সে অর্ধেক পাখী, অর্ধেক সিংহ, তার শরীর সিংহের মত, মুখের আকৃতি ঈগলের মত, আর তার ছড়ানো পাঁজরের সাথে কল্পনার রং মিলিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে পাখীর ডানা। সিংহ এবং ঈগলের শক্তিতে বলীয়ান দুর্দ্ধর্ষ এই গ্রিফিন নাকি সেখানকার সোনার খনিগুলোকে পাহারা দেয়! পরবর্তীতে অ্যারিস্টিয়াসের লেখা গল্পে দেখা যায় মানুষ ঘোড়ায় চড়ে এই গ্রীফিনদের সাথে যুদ্ধ করছে সোনার খনিগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু এদিকে আবার ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়ানো প্রোটোসেরাটপ নামের ডায়নোসরেরও মুখটা ছিলো অনেকটা পাখির ঠোঁটের মত, পাগুলো ছিলো পাখির মতই সরু সরু। অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন শুনি

ডায়নোসারেরাই ছিলো আজকের যুগের আধুনিক পাখিদের পূর্বপুরুষ। অনেকদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা ধারণাটি করে থাকলেও সম্প্রতি চায়নায় পাওয়া বেশ কিছু মধ্যবর্তী ফসিল থেকে তারা আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পেয়েছেন যে, এক ধরণের ডায়নোসর থেকেই আসলে পাখির বিবর্তন ঘটেছে। তবে সে আলোচনা এখনকার জন্য তোলা থাক, খানিক পরে এই অধ্যায়েই এই নতুন আবিষ্কারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো। এখন আপাতত আড্রিয়ানা মেয়রের লেখা The Fossil Hunter বই থেকে স্ক্যান করা একটা ছবিটা তুলে দেওয়া যাক পাঠকদের জন্য। প্রোটোসেরাটপের ফসিলের সাথে এই লেজেন্ড গ্রিফিনের উড়ন্ত ছবি এবং পাশে রাখা প্রাচীন একটি গ্রিফিনের একটি মূর্তির মধ্যে এতো মিল দেখে যে কেউই হয়তো অবাক হবেন।

আড্রিয়ানা মেয়রের লেখা The fossil Hunters বই থেকে স্ক্যান করা ছবিটাতে প্রোটোসেরাটপের ফসিলের সাথে এই লেজেন্ড গ্রিফিনের উড়ন্ত ছবি এবং পাশে রাখা প্রাচীন একটি গ্রিফিনের একটি মূর্তি

প্রাচীন লোককাহিনীতে শোনা যায়, মহাপরাক্রমশীল রোমান সেনাপতি কুইন্টাস সারটোরিয়াস মরোক্কো দেশের প্রাচীন শহর টিঙ্গিস এ পৌঁছালে সেখানকার স্থানীয় আধিবাসীরা তাকে কুখ্যাত রাক্ষস অ্যান্টিয়াসের কবর দেখাতে নিয়ে যায়। সারটোরিয়াস নাকি ৮৫ ফুট দীর্ঘ এই কঙ্কাল দেখে এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে সে তাকে আবার নিজের হাতে শ্রদ্ধাভরে তাকে দাফন করার ব্যবস্থা করে দেয়। অ্যান্টিয়াস গ্রীক পুরানের একজন সহিংস রাক্ষষ, যাকে পরে বিখ্যাত মহাবীর হারকিউলিস হত্যা করে মানব জাতিকে রক্ষা করেন! অনেকে মনে করেন যে বিশালাকার এক আদিম হাতী অ্যানানকাস (Tetralophodon longirostris, Anancus) এর ফসিল ছাড়া হয়ত এটি আর কিছুই ছিলো না। কুভিয়ের মতে, অনেক সময়ই স্থানীয় লোকেরা হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলোর আকারকে ৮-১০ গুণ হারে অতিরিঞ্জিত করে এই ধরনের বিভিন্ন রূপকাহিনীর জন্ম দিতো। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই অঞ্চলেই এধরণের প্রাচীন হাতী, ম্যামথ (M. africanavus) বা দৈত্যকার জিরাফ থেকে শুরু করে প্রাগঐতিহাসিক ইওসিন যুগের

বিশাল তিমি মাছের (Eocene whales) ফসিলের ছড়াছড়ি দেখা যায়, যাদের কারও কারও হাড়ের দৈর্ঘ্য

ফ্লোরেনস মিউসিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টিরিতে অ্যানানকাস বা বিশালাকার সেই আদিম হাতীর ফসিল

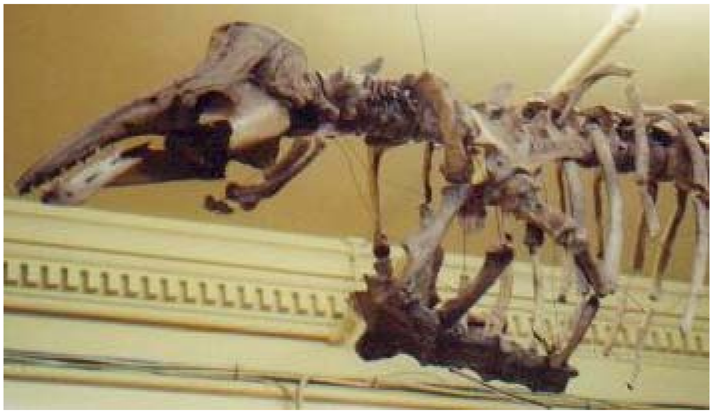

ইওসিন যুগের বিশাল তিমি মাছের ফসিল

আবার ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিলো! এখান থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দুরে অ্যাটলাস পাহাড়েই বিস্ময়কর রকমের বড় আকারের ডাইনোসরের কিছু ফসিল পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গ্রীসের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক ক্রীট দ্বীপে (এই ক্রীট দ্বীপের সাথেই প্রাচীণ ভারতীয় সভ্যতা মহেঞ্জোদারোর বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো বলে ধারণা করা হয়) খুঁজে পেয়েছেন আদিম দানবাকৃতি হাতি *Deinotherium giganteum* এর ফসিল (৩)। এই প্রকান্ড ১৫ ফুট লম্বা, সারে চার ফুট দাঁতওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণীটাকে আজকের আধুনিক হাতীদের দুর্সম্পর্কের খালাতো ভাই হিসেবে ধরা যেতে পারে। সৃষ্টির আদি থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে হেটে বেড়ানো বিশালতম প্রাণীদের মধ্যে এরা অন্যতম। আজকের যুগের বিজ্ঞানীরা যখন মাথার মাঝখানে বিশাল গোলাকৃতি গর্তসহ এদের মাথার খুলির ফসিল খুঁজে পান তখন তারা বহু অভিজ্ঞতার আলোকে ধরে নেন যে এখানে নিশ্চয়ই লম্বা একটা শুড়ই ছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন তো কয়েক হাজার বছর আগের আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা - পাহাড়ের

গায়ে, নদীর পাড়ে বা মাটি খুঁড়ে ভাঙ্গাচোরা, আংশিক ফসিলগুলোর হাড়গোড়ের মধ্যে হঠাৎ করে এধরনের একটা দানবীয় মাথা ফুঁড়ে বেরোলে এমনিতেই তো তাদের চমকে ওঠার কথা, তার উপরে আবার যদি দেখা যায় সেই মাথার মাঝখানে এক বিশালাকার গর্ত, তাহলে তাকে একচোখা রাক্ষষ হিসেবে কল্পনা করা ছাড়া আর কিইবা উপায় খোলা থাকে তাদের সামনে? গ্রীক মিথলজী ভয়ানক মানুষ খেকো একচোখা দৈত্য সাইক্লোপের উৎপত্তি যদি এখান থেকেই ঘটে থাকে তাহলেও আবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আমরা প্রাচীণ কাব্যকার হোমারের গল্পেও এই একচোখা দৈত্য সাইক্লোপের কথা শুনতে পাই। ক্রীট দ্বীপের আশেপাশের এলাকায় এধরণের অনেক বিশাল বিশাল আদিম প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে, তাই অনেক গবেষক মনে করেন যে, এ অঞ্চলে তৈরি হওয়া মিথগুলোর সাথে হয়তো এদের একটা সম্পর্ক ছিলো।

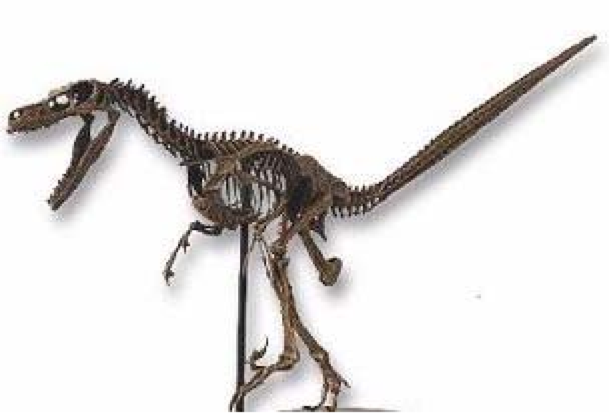

ড্রাগনের অস্তিত্ব দেখা যায় পৃথিবীর অনেক দেশের রূপকথায়ই, তবে চীন দেশের রংবেরং এর, মুখ থেকে আগুনের ফুল্‌কি ্ছোটানো, বিভিন্ন ধরণের ড্রাগনের গল্পই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী শোনা যায়। দুই হাজার বছরেরও আগে খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ শতাব্দীতে চ্যাং কুর লেখায় আমরা যে ড্রাগনের হাড় খুঁজে পাওয়ার গল্প শুনি তাও মনে হয় ডায়নোসরের ফসিলই

ছিলো। পাশাপাশি রাখা ডায়নোসরের পাশাপাশি রাখা ডায়নোসরের ফসিল এবং আমাদের পুর্বপুরুষদের কল্পনার তুলিতে বানানো ড্রাগনের মধ্যে মিল দেখে এরকম সন্দেহ জাগাটাই বোধহয় স্বাভাবিক। এমনকি মধ্যযুগেও চীন থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় দাঁতের ফসিল গুড়ো করে সর্বরোগের নিরামক হিসেবে ওষুধ বানানোর রেওয়াজ ছিলো। ইউরোপে মনে করা হতো যে, এই ফসিলগুলো নুহের প্লাবনে ভেসে যাওয়া মৃত প্রাণীদের ধ্বংসাবশেষ।

অনেকেই ধারণা করেন যে, ভুমধ্যসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যীয় অঞ্চলে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল পাওয়া যেতো বলেই প্রাচীণকালে সেখানকার মানুষের মনে মহাপ্লাবনের ধারণটা বদ্ধমূল হয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করতো একসময় নিশ্চয়ই সমগ্র পৃথিবীটাই পানির নীচে ডুবে গিয়েছিলো, না হলে পাহাড়ের উপরে, উচ্চভূমির পাথরের বুকে কেনো এতো সামুদ্রিক প্রাণীর ধংসাবশেষ বা ফসিল খুঁজে পাওয়া যাবে! আর সেখান থেকেই শুরু হয় নুহের মহাপ্লাবনের কল্পকাহিনী। এখন আমরা আধুনিক ভুতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে বুঝতে পারছি যে, বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের পানির লেভেল ওঠানামা করলেও এধরনের পৃথিবীব্যাপী মহাপ্লাবন আসলে কখনই ঘটেনি। তবে অবাক করা কান্ড হচ্ছে যে, প্রথমবারের

মত বৈজ্ঞানীক দৃষ্টিকোন থেকে এই নুহের মহাপ্লাবনের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে দেন যে ব্যক্তি তিনি আর কেউ নন আমাদের সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি(৪)। হ্যা, মোনালিসার চিত্রকর ভিঞ্চিকে আমরা সাধারণত একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হিসেবে গন্য করলেও জ্ঞান বিজ্ঞানে তার বহুমূখী প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। লিওনারদো দ্য ভিঞ্চির জীবনীকার জর্জিও ভাসারি তার বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন,'তার এতই বিরল ধরণের প্রতিভা ছিলো যে তিনি যাতেই মনোনিবেশ করতেন তাতেই পান্ডিত্য অর্জন করে ফেলতেন। তিনি এতদিকে তার প্রতিভার উন্মেষ না ঘটালে হয়তো একজন

লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci, 1452- 1519)

সেরা বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন।' সে যাই হোক, এই কালজয়ী ব্যক্তির প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে আসছি, আগে দেখা যাক তার পূর্বপুরুষেরা ইতিহাসের কোথায় কখন কিভাবে ফসিলের কথা উল্লেখ করে গেছেন।

কখন মানুষ প্রথম ফসিলের সংস্পর্শে আসে তা হয়তো আমাদের কখনই আর জানা হবে না। লিখিত ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কয়েকজন গ্রীক দার্শনিক তাদের লেখায় ফসিলের কথা উল্লেখ করেছিলন। সমসাময়িক ধর্মীয় এবং মিথের উপর ভিত্তি করে লেখা হলেও প্রথম প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ এবং পৃথিবী সৃষ্টির কথা শোনা যায় গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যন্ডারের (Anaximander, 611 - 546 B. C.) কাছ থেকে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যে, সেই প্রাচীনকালেই তিনি মনে করতেন বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডকে কেউ সৃষ্টি করেনি, এর সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনের ফলে! প্রাণের সৃষ্টির পিছনে রয়েছে ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে এক ধরণের বস্তু, যা সুর্যের তাপে শুকিয়ে গিয়ে প্রাণ তৈরি করেছে এবং অন্যান্য অনেক প্রাণীর মতই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে মাছ থেকে (৬)। তিনি ফসিলের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও পরবর্তীতে, তার শিষ্য জেনোফেন (Xenophanes of Colophon, died 490 B.C) তার এই ধারণাগুলোর বিস্তৃতি ঘটান, তিনিই প্রথমবারের মত পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে লিখতে গিয়ে ফসিলের প্রসংগ উল্লেখ করেন। তার মতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিলো পানির ঘনীভবন এবং আদিম কাঁদার মেলবন্ধনে। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসবিদ, হেরোডোটাসও (Herodotus (484-425 B.C.) শামুকসহ বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক প্রাণীর শেল বা খোলসের ফসিল দেখে সিধান্তে আসেন যে মিশর দেশ একসময় পানির নীচে নিমজ্জিত ছিল। তিনি মোকাত্তাম নামের আরবের এক উপত্যকায় বর্ণনাতীত রকমের বিশাল আকারের মেরুদন্ডওয়ালা সাপের ফসিলের কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়াও আরও কয়েকজন গ্রীক

দার্শনিকের লেখায়ও আমরা ফসিলের কথা দেখতে পাই। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক ডাক্তার হিপোক্রিটস (Hippocrates of Cos 460-357 B.C) যিনি নিজে একজন ফসিল সংগ্রাহক ছিলেন। সম্প্রতি প্রত্নতাত্তিক খননের সময় তার বিখ্যাত মেডিকেল স্কুলের ভিতর থেকে আদিম হাতীর দাঁতের ফসিলও পাওয়া গেছে (৫)।

তবে লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি সেই পনেরশো শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিজে ইটালির মিলান শহরের সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে চিত্রকলা, শারীরস্থানবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভুগোল, জোতির্বদ্যা এমনকি ফসিলবিদ্যা পর্যন্ত। তিনিই বোধ হয় প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফসিলের ব্যাখ্যা দেন। ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজ করার সময় তাকে প্রায়শই পাহাড়ের গা কেটে সুরংগ বা রাস্তা বানাতে হত। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়ের স্তরীভুত শীলাগুলো বিভিন্ন সময়ের তলানি থেকে সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন স্তরের জন্ম দিয়েছে, তাই আমরা সবসময়ই পাহাড়ের গায়ে বা মাটিতে বিভিন্ন স্তর বা strata দেখতে পাই। অদ্ভুত ব্যাপার হল, তিনি সে সময়ই স্তরের পর্যায়ক্রম বা Superposition এর ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছিলেন, যার ব্যাখ্যা পেতে পেতে আমাদের আরও প্রায় দু'শো বছর লেগে গিয়েছিলো! ১৬৬৯ সালে ডেনিশ বিজ্ঞানী নিকোলাস স্টোন প্রথম Superposition সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করেন। স্তরীভুত পাললিক শিলার সবচেয়ে নীচের স্তরটা হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো, আর তার উপর ক্রমান্বয়িকভাবে একটার পর একটা স্তর তৈরি হয়েছে, তাই স্তরে স্তরে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন যুগের জীবদের অস্তিত্ব কিংবা বিলুপ্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। ভিঞ্চি বুঝেছিলেন যে, ফসিলগুলো আসলে পৃথিবীর আদিম জীবদের নিদর্শন এবং পাহাড়ের গায়ে যে সামুদ্রিক সব প্রাণীর ফসিল দেখা যাচ্ছে তার কারণ আর কিছুই নয়, একসময় আসলে এই পাহাড় গুলো সমুদ্রের নিচে ছিল। তবে বিশ্বব্যাপী প্লাবণের ধারণাটার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাকেই প্রথম আমরা বলতে শুনি যে, বিশ্বব্যাপী নুহের প্লাবণের কাহিনীটা একটা অসম্ভব ঘটনা, সারা পৃথিবীই যদি পানির নিচে ডুবে যাবে তাহলে এই পরিমাণ পানি সরে গেলো কোথায়। আর এই ফসিলগুলো কোনভাবেই বন্যায় ভেসে যাওয়া প্রাণীদের দেহাবশেষ হতে পারে না, কারণ সব কিছু বানের জলে ভেসে গেলে তাদের বিস্তীর্ন এলাকাজুড়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কথা, তারা এ ভাবে সুগঠিতভাবে মাটির স্তরে স্তরে সাজানো থাকতে পারতো না (৪)।

তারপর আমরা আঠারশো শতাব্দীর শেষ দিকে এবং উনিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'Age of enlightment' এর ফসিল সংগ্রহের অনেক কাহিনীই শুনতে পাই। এদিকে ফসিলবিদ্যার জনক জর্জ কুভিয়ে এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার জনক উইলিয়াম স্মিথ শীলার গঠন, স্তর এবং সেই অনুযায়ী ফসিলের বিন্যাসেরও বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কুভিয়ে থেকে শুরু করে সব বিজ্ঞানীই বাইবেলের জ্ঞানানুযায়ী ৬ হাজার বছর বয়সের পৃথিবী এবং নুহের প্লাবনের মত কাহিনীগুলোকে বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়ে তাদের কাজ চলিয়ে গেছেন। তার ব্যতিক্রম আমরা প্রথম দেখলাম জেমস হাটনের ব্যাখ্যায়, যিনি বললেন একটা কোন বড় ধরণের দুর্যোগ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হতে পারেনা, এর সৃষ্টির পিছনে রয়েছে অত্যন্ত লম্বা সময় ধরে ধীরে ধীরে ঘটা পরিবর্তন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েই এই বিষয়ে হাটন এবং পরবর্তীতে চালর্স লায়েলের অবদানের কথা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম যার উপর ভিত্তি করেই আসলে ডারউন পরবর্তীতে বিবর্তনের তত্ত্ব প্রস্তাব করতে সক্ষম হন।

ফসিলের ইতিহাসের গল্প বলতে গিয়ে ফসিল জিনিসটা আসলে কি তাইই এখনও বলা হয়ে ওঠেনি। আবার ওদিকে ফসিলের ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে হলে আরও কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আপনারা খেয়াল করেছেন বোধ হয় যে ফসিল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রায়শই ভূতাত্ত্বিক

সময়সীমা এবং বিভিন্ন যুগ বা পিরিয়ডের কথা এসে পড়ছে। এই যুগগুলোকে ঠিকমত না বুঝলে ফসিলের গুরুত্ব এবং অর্থও ঠিকমত বোঝা সম্ভব নয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরগুলো বুঝতে হলে তারা কিভাবে সৃষ্টি হল তার সম্পর্কেও একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন, আর সেখানেই চলে আসে *প্লেট টেকটনিক্স* এবং মহাদেশীয় সঞ্চরণের প্রসংগ। ওদিকে আবার ফসিলগুলোর বয়স কিভাবে আধুনিক উপায়ে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় সেটা বুঝতে হলে দরকার রেডিয়োঅ্যাকটিভ বা কার্বন ডেটিং সহ বিভিন্ন ধরণের ডেটিং প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিতি। এই বিষয়গুলোকে নিয়েই লেখার আশা রইলো পরবর্তীতে।

References:

1. Charles Darwin (1859), 'Origin of Species', (last words of the book) Bantam Books, 1999, USA.

2. Adrienne Mayor, 2000, The First Fossil Hunter, Princton University Press, NJ, USA.

3. Hillary Mayell, February 5, 2003, for National Geographic News, 'Cyclops Myth Spurred by "One-Eyed" Fossils?': http://news.nationalgeographic.com/news/2003/02/0205_030205_cyclops.html

4. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/vinci.html
5. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/ancient.html
6. Bertrand Russel, 1946, History of Western Philosophy, pg 36.